জমি অধিগ্রহণ আইন এবং উন্নয়ন ও উচ্ছেদের মৌলিক দ্বন্দ্ব

মৈত্রীশ ঘটক
পরীক্ষিৎ ঘোষ

১

ইউপিএ -র জমি অধিগ্রহণ আইন সংশোধন করতে গিয়ে বর্তমান সরকারকে সংসদে এবং সংসদের বাইরে যথেষ্ট বেগ পেয়ে অবশেষে পিছু হঠে যেতে হল। তার সাথে সাথে মোদী সরকারের মধুচন্দ্রিমা পর্বেরও যবনিকাপাত হল। প্রায় দেড় বছর হতে চলল এই সরকারের, এখন অবধি কোনো উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সংস্কার রূপায়িত হয়নি। প্রাথমিক উচ্ছাস স্তিমিত হবার পরে শেয়ার বাজার চলছে মন্থর গতিতে, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হারে কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়নি। ইউপিএ জমানার শেষ দু-তিন বছরের বেহাল অর্থনীতির পালে হাওয়া লাগবে এই আশায় হিন্দুত্ববাদের সমর্থক না হলেও যাঁরা মোদীকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হতাশার ছাপ স্পষ্ট।

যে দেশে অর্ধেকের বেশি মানুষ আজও কৃষির ওপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ গড়ে প্রতি দুই ভোটদাতার প্রায় একজন কৃষিজীবী, সেখানে যে কোন রাজনৈতিক দলই কৃষি-বিরোধী প্রতিপন্ন হতে চাইবেনা। তাই জমি অধিগ্রহণ আইন প্রণয়নের পথে কাঁটা যতই থাকুক, মোদী-শাহ জুটিকে তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবাচ্ছে জমি বিল

সংক্রান্ত অবিরাম চাপান-উতোর, রাজনৈতিক ভাবমূর্ত্তির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক কৃষক-বিরোধী তক্‌মা, এবং এই প্রশ্নে পুনরুত্থিত ও জোটবদ্ধ হয়ে ওঠা বিরোধীপক্ষ। ইন্দিরা-রাজীবের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার নটেগাছটি কীভাবে মুড়িয়েছিল সে গল্প তো কারুর অজানা নয়। দিল্লির ভোটযুদ্ধে কচুকাটা হবার পর তাই এখন মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিহারের রাজ্য নির্বাচন নিয়ে । কৃষিপ্রধান অনগ্রসর এই রাজ্যে ভোটের আগে "জমি অধিগ্রহণ" কথাটি ঘুণাক্ষরেও উলেখ করা বাতুলতা ।

২

আসলে অর্থনৈতিক নীতির প্রসঙ্গে এ দেশের সব রাজনৈতিক দলই সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ভালমন্দের বিচার করে থাকে। ক্ষমতায় থাকলে তাদের অবস্থান ও ভাবভঙ্গী হয় একরকম, ক্ষমতায় না থাকলে অন্যরকম। এফডিআই (প্রত্যক্ষ বিদেশী লগ্নী) সংক্রান্ত যে স্বদেশীয়ানা বিরোধীপক্ষের আসনে বসা বিজেপি-র মধ্যে দেখা গেছিল, তার এক আনাও যেন আজকাল দেখতে পাওয়া যায়না। ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্পের দোহাই দিয়ে চাষীদের জমির সরকারীভাবে বাজেয়াপ্ত করার ঘোর বিরোধী ছিল সিপিআই (এম) পার্টি – ব্যতিক্রম শুধু সেই সব রাজ্য, যেখানে তারা নিজেরাই সরকার চালাচ্ছে। আজ যে কংগ্রেস পার্টি সুট্-বুট্-কি-সরকার -এর বিরুদ্ধে জিগির তুলেছে, তাদেরই নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের জমানায় আমরা দেখেছিলাম বৃহৎ পুঁজি ও সরকারের মধ্যে আঁতাতের চরম নিদর্শন।

নিছক ভন্ডামী ও সুবিধাবাদী মনোভাব বলে এসব জিনিস অগ্রাহ্য করাই যায়। কিন্তু

তা করলে, আমাদের রাজনীতির অঙ্গন কেন যে এমন পালাবদলের হাস্যকৌতুকে পর্যবসিত হল, তার একটা গভীরতর কারণ অধরা থেকে যাবে। আসলে, এই পরিস্থিতি হল উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের দু'টি পরস্পরবিরোধী সামাজিক চাহিদার মধ্যে সংঘর্ষের প্রতিফলন – অর্থাৎ, বহুর উন্নতি বনাম এককের স্বার্থরক্ষা। এই স্বার্থের সংঘাত অন্ততঃ কিছুটা সহনীয় করার চেষ্টায় অভিনব কোনো নীতি প্রণয়নের কথা কিন্তু কেউ ভাবেননা। আমাদের রাজনৈতিক নেতারা বিরোধীপক্ষে থাকলে ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা নিয়ে জোর সওয়াল করেন, আবার ক্ষমতায় গেলে অন্য কিছু না ভেবে শুধু সামগ্রিক উন্নতি সাধনের চেষ্টায় ভয়ানক উদ্যোগী হয়ে ওঠেন।

৮০ -র দশকের শেষ থেকে ৯০ -এর গোড়া পর্যন্ত যে অর্থনৈতিক উদারীকরণ হয়েছিল, তার ফলে আমাদের বৃদ্ধির হার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য। গত প্রায় এক দশক ধরে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে একটা মতবাদ – নিছক অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার দেখলেই চলবে না, চাই সর্বজনের উন্নয়ন। কিন্তু এই সর্বজনের উন্নয়ন কথাটার কি আদৌ কোনো বাস্তব তাৎপর্য্য রয়েছে, নাকি তা শুধুই সান্ত্বনার ভাষা?

এর দু'রকম ভিন্নমুখী উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, সনাতন বৈষম্য এবং তদুদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক বেড়াজাল হঠাতে গেলে চাই সর্বজনের উন্নতি। বৃদ্ধিশীল অর্থনীতিতে উপার্জনের অনেক নূতন পথ খুলে যায় ঠিকই, কিন্তু সে সব পথ প্রায়শঃই সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়, আর হতভাগ্য সেই মানুষেরা ঘুরে মরতে থাকে দারিদ্রের দুষ্টচক্রে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুঁজি, ঋণের প্রাপ্যতা প্রভৃতির চূড়ান্ত অভাবজনিত কারণে দরিদ্র পরিবারগুলি

কিছুতেই দারিদ্রের মরণফাঁদ কাটিয়ে বেরোতে পারে না। এক প্রজন্মের অপারগতার ভার বর্তায় পরবর্ত্তী প্রজন্মের ওপরে। বাজার-নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এই মরণফাঁদের থেকে নিষ্ক্রমণের কোনো পথ দেখায় না। একমাত্র রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও সাহায্য ছাড়া এর থেকে বেরোনোর আর কোনো উপায়ই নেই।

সর্বজনীন উন্নতির দ্বিতীয় একটা আবশ্যকতা রয়েছে, যার কথা অনেকেই মনে রাখেন না। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই সৃষ্টি হয় নূতন বৈষম্য ; অর্থাৎ সকলেরই পৌষ মাস নয়, কারো কারো সর্বনাশও হয়। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গোঁড়াপন্থী সমর্থকরা ভাবতে ভালবাসেন যে তাঁদের এ জোয়ারের জল যত ফুলে-ফেঁপে উঠবে, তত সকলের নৌকোই সমান তালে ভেসে উঠতে থাকবে। এ এক অবাস্তব আশাবাদী মনোভাব। বরং জোসেফ শুম্পেটারের বক্তব্য অনেক বাস্তবসম্মত – অর্থনৈতিক প্রগতি হল এক ধরণের সৃজনশীল ধ্বংসলীলা । সাবেকী নৈপুণ্যের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, সাবেকী পেশার মৃত্যু হয়। তাদের জায়গা দখল করে নূতন পেশা, নূতন কলাকৌশল। জোরদার কোনো সামাজিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা না থাকলে দেখা যায়, সনাতন আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যারা পঙ্গু হয়ে পড়ল, এবং সদ্য খুলে যাওয়া নূতন পথ ধরে যারা এগিয়ে যেতে পারল, তারা প্রায়ই দুটি ভিন্ন গোষ্ঠী।

আমাদের শ্রমনিবিড় ও অলাভজনক খুচরো ব্যবসার জায়গা যদি বৃহৎ বিপণী ও আধুনিক যোগান-ব্যবস্থা দখল করতে পারে, তা হলে পণ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে, এবং মাত্রাজনিত সাশ্রয়ের (returns to scale) সুবিধাও পাওয়া যায়, তাতে কৃষকের ভালো, ক্রেতারও ভালো । কিন্তু মুদির দোকানী, সব্জিওয়ালা এঁদের কী হবে?

যান্ত্রীকিকরণ ও সেচ – এই দুইয়ের জোরে এগিয়ে যাবে কৃষি-উৎপাদন, মানুষ কারিগরী শিল্প বা পরিষেবাতে নিযুক্ত হয়ে উপার্জন করার ফুরসত পাবে। কিন্তু কৃষিকর্মীরা কি পারবে রাতারাতি লাঙল ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ার বা নিদেনপক্ষে কারখানার শ্রমিক-সর্দার হতে? তাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো পারবে, কিন্তু তারা নিজেরা? কম্পিউটারের সাহায্যে কেরানী বা আধিকারিকদের কাজ সহজ ও দ্রুত হয়। কিন্তু অনেক কেরানী বা আধিকারিকের প্রয়োজনও ফুরোয়।

এইসব কঠিন দ্বন্দ্বের মুখে পড়ে দেশের নেতারা বারবার রঙ পাল্টাতে থাকেন, এবং চিন্তাবিদরা প্রায়শঃই উটপাখীর মতো বালিতে মাথা গুঁজে নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। উন্নয়নের প্রসবযন্ত্রণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বামপন্থীরা পুরো দোষটা চাপিয়ে দেন পুঁজি-সরকার আঁতাত এবং তাঁদের সেই পুরোনো জুজু নব্য-উদারনীতির ঘাড়ে। ভুলে যান, ভূতপূর্ব সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে কি নিষ্ঠুর পথে শিল্পায়ন হয়েছিল । দক্ষিণপন্থীরা পুরো বিষয়টাকে অকারণ আতঙ্ক বা সৎ কাজে বাধা দেওয়ার অপচেষ্টা বলে উড়িয়ে দেন । বৃদ্ধি হলে শেষ পর্যন্ত সবার ভালো হবে এই ধরণের সেরে গেলে ভালো হয়ে যাবে ধরণের কথা বলে বা একশো-আটবার উন্নয়নের নামজপ করলেই বিপদ কেটে যাবে, এই বিশ্বাসে অটল থাকেন।

আসলে এই কঠিন কথাটা মেনে না নিয়ে উপায় নেই যে, ভাল বা মন্দ যে কোনো ধরণের পরিবর্তনেই মানবসমাজে অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয়ের সূচনা হয়। এবং যাদের ওপরে কোপটা বেশি করে পড়ল, তারা আপত্তি করবেই, উন্নয়নের পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবেই। নইলে বলতে হয় বহুর উন্নতির স্বার্থে কিছু মানুষকে বলির পশু হতে বাধ্য করা হল। বলা বাহুল্য, এ দুটোর কোনোটাই অভিপ্রেত নয়। একথা যেমন ঠিক যে

ডিম না ভেঙে অমলেট বানানো যায়না, সেরকম ডিমটা যে ভাঙা হচ্ছে সেটা কার সেকথাও খেয়াল রাখতে হবে ।

এই হল উন্নয়ন ও উচ্ছেদের মৌলিক দ্বন্দ্ব – একটি পুরনো রাজনৈতিক স্লোগানের ভাষা খানিক পাল্টে বলা যায়, উন্নয়ন কোন সৌখিন চা-এর আসর নয় । উন্নয়ন ও উন্নয়নপীড়িত মানুষ – এদের পরস্পরের হাত থেকে উদ্ধার করার কোনো উপায় আছে কি?

উন্নয়নের হরেক দস্তুর, কিন্তু সব রকমেই একটা বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় – কৃষি, কারিগরি বা পরিষেবা, সব জায়গাতেই উৎপাদনের মূল উপাদানগুলি, অর্থাৎ জমি, শ্রম প্রভৃতি, ঢাল-উপুড় হয়ে নতুন ধরণের প্রয়োজন মেটাতে নতুন ভাবে বিন্যস্ত হয়। বর্তমান দুনিয়ার ধনী দেশগুলো ঐতিহাসিকভাবে এই সব পর্ব উৎরে তবেই আজকের জায়গায় এসে পৌঁছেছে – এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৫০ সালে কর্মরত জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ কৃষিতে নিযুক্ত ছিলেন। ২০১২ সালে সেটা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১.৫ ভাগ। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে পৌঁছনোর আগেই ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল, সুতরাং সেখানে ১৮৪০ সালের মধ্যেই এই পরিসংখ্যান ২২ শতাংশে নেমে গিয়েছিল, এবং অধুনা ১ শতাংশ।

সহজ বুদ্ধিতেই এটা বোঝা যায়। উন্নয়ন কথার অর্থ যদি হয় আরও বেশি স্কুল, হাসপাতাল, পাকা রাস্তা, গ্রামগঞ্জের বিদ্যুতায়ন, তাহলে এ সব ঘটাতে শিল্প-উৎপাদন তো বহু গুণ বাড়াতেই হবে। নইলে এ সব ভাল ভাল জিনিস তো গাছে ফলবে না।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, অর্থনীতিতে এই ধরণের বৃহৎ ক্ষেত্র-পরিবর্তন ঘটার সময় প্রায়ই বলপ্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়েছে, এবং বহু মানুষকে দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করতে হয়েছে। ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের সময় ভূমি-পরিবেষ্টন আন্দোলন (enclosure movement) এসে চাষীকে তার জমির থেকে উৎখাত করেছিল। রাশিয়াতে বিপ্লব-পরবর্ত্তী রাষ্ট্র কৃষি-উৎপাদনকে নিষ্পেষিত করে তার শেষ বিন্দুটুকু শুষে নিয়েছিল ভারী শিল্পের রসদ জোগাতে। দেং জিয়াও পিং -এর আমল থেকে শুরু করে চৈনিক অর্থনীতির যে বিপুল বিষ্ফোরণ, তা সম্ভব হয়েছিল দেশের সব জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে ছিল বলেই, যার ফলে ছোটখাটো জমি-মালিকদের খুচরো আপত্তির তোয়াক্কা না করে সুবিধামতো যে কোনো জায়গায় শহর ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা গেছিল। গণতান্ত্রিক দেশের ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের পক্ষে এ ধরণের চাবুক হাঁকানো সম্ভব নয়।

উন্নয়নের এই দ্বন্দ্ব বিশেষতঃ কৃষিক্ষেত্রে মারাত্মক আকার ধারণ করে। উন্নয়নের শর্তই হল, চাষবাসের গুরুত্ব ক্রমশঃ কমবে, আর সেখানকার উদ্বৃত্ত রসদ অন্য ধরণের উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হবে। কিন্তু চাষীদের ভবিষ্যতের কথাও তো অগ্রাহ্য করা যাবে না। আগেই বলেছি, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এখনও গ্রামবাসী, এবং কৃষিকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ভোট তাদের হাতে। ভূমি-সংস্কারই হোক আর ভূমি-অধিগ্রহণ, ভূমি-বিষয়টি তাই ভারতের রাজনীতিতে ভূমিকম্প ঘটিয়ে দিতে সক্ষম ।

এই কারণেই জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে সরকারকে যথেষ্ট সাবধানে পা ফেলতে হয় । সংসদে ২৮২ আসনের ঐতিহাসিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এলেও,

একজন তথাকথিত স্থিরসিদ্ধান্তের দৃঢ়চেতা মানুষকে মসনদে বসালেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না।

জমি অধিগ্রহণ বিষয়টা আইনের মারপ্যাঁচ, খুঁটিনাটি ও রাজনৈতিক চাপান-উতোরে এতটাই নিমজ্জিতরয়েছে যে, একটা মৌলিক প্রশ্ন করার সুযোগ প্রায়ই পাওয়া যায় না। তা হল, কৃষি-ব্যবহারের থেকে সরিয়ে নিয়ে জমিকে অন্য কাজে লাগাতে কোন মূল নীতি আমরা অনুসরণ করব? এর একটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেলে অনেক ভুল-বোঝাবুঝি এড়ানো যেত।

৩

২০১৫ সালের প্রস্তাবিত (এবং অধুনা প্রত্যাহত) এনডিএ সরকারের জমি অধিগ্রহণ সংশোধন আইন ২০১৩ সালে ইউপিএ সরকারের প্রণয়ন করা আইনের মূল কাঠামো থেকে খুব একটা সরেনি । যেমন, প্রতিরক্ষা এবং পরিকাঠামো সম্পর্কিত কিছু উদ্যোগের ক্ষেত্রে জমি নেওয়ার পথ আরেকটু সহজ করা হয়েছিল, কিন্তু ক্ষতিপূরণের অঙ্কে কোন কলম ছোঁয়ানো হয়নি । তাই জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বর্তমান অচলাবস্থা বুঝতে গেলে ইউপিএর আমলের আইনের কিছু দিক ভাল করে বুঝতে হবে ।

২০১৩ সালের আগে দেশে জমি অধিগ্রহণ পরিচালিত হোত ঔপনিবেশিক আমলে চালু করা ১৮৯৪ -এর আইন অনুযায়ী । সিঙ্গুরেও এই আইনই ব্যবহৃত হয়েছিল । বর্তমানে খারিজ হয়ে যাওয়া এই আইনে সরকার নির্ধারিত জমির দর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, যার অনেকসময়েই সেই জমির বর্তমান বাজার

দরের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকতনা। বর্তমান বাজার দর ঠিকমত যাচাই করে যদি সেই দামেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোত, তাতেও জমি-মালিকের প্রতি অবিচার এড়ানো যেতনা। তার মূল কারণ তিনটে।

প্রথমত, বর্তমান বাজার দরে যদি জমির মালিক বেচতেই রাজি হতেন, তাহলে তো আর জোর করে অধিগ্রহণ করার দরকার হতনা।

দ্বিতীয়ত, বাজার দর বা জমির মান এক হলেও যে দামে দুই জমির মালিক জমি ছাড়তে রাজি হবেন, তা সচরাচর এক হয়না, তাঁদের ব্যক্তিগত অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যেমন জমির মালিক কৃষিজীবী হলে, তাঁর কাছে জমির মূল্য যে জমির মালিক কর্মসূত্রে শহরে থাকেন তাঁর থেকে বেশি হবে। বাজার দর অথবা বাজার দর নির্ভর কোনো ক্ষতিপূরণের ফর্মুলা ব্যবহার করলে, জমির মালিকদের মধ্যে জমির মূল্যের যে ভিন্নতা, তার প্রতি সুবিচার করা হয়না।

তৃতীয়ত, কোনো অনুন্নত কৃষিপ্রধান এলাকায় যদি হঠাৎ কল-কারখানা অথবা শিল্পতালুক তৈরি হয়, তবে রাতারাতি সে অঞ্চলের ভোল পাল্টে গিয়ে সেখানে ঘরবাড়ি তৈরি করার হিড়িক পড়ে যায়। একটা কারখানা বা টাউনশিপ হলে এলাকায় জমির দর হু-হু করে বেড়ে যায়, আর তাই ক্ষতিপূরণের টাকায় সমপরিমাণ জমি কেনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কিছু চাষী পুরনো আবাদী দরে সরকারকে জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, অথচ শিল্প গড়ে ওঠার পরে তাদের পড়শিরা অথবা বহিরাগত কিছু লোক নতুন দরে খুচরো খদ্দেরকে জমি বেচে মোটা দাঁও মারল – এর ফলে যে প্রথম দলের লোকেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে, তাতে আর

আশ্চর্য্য কী। তাই জমির দরই যদি দেখতে হয়, বর্তমান নয়, ভবিষ্যতে জমির সম্ভাব্য দরও বেশি প্রাসঙ্গিক ।

এই মান্ধাতার আমলের অন্যায় আইনের তাই সংস্কার অতি জরুরি ছিল । ২০১৩ - র আইনটির উদ্দেশ্যও তাই ছিল । উদ্দেশ্য সঠিক হলেও, সমস্যা হল তার রূপায়নে । নতুন এই আইনে তিনটি সম্পূর্ণ আলাদা এবং আপাত-বিরোধী তত্ত্বের প্রয়োগ দেখা যায় ।

প্রথম তত্ত্বর মূলে বাজারের যুক্তি – যথেষ্ট দাম দিলে যে কোন জিনিস কেনা যায় । অতএব ক্ষতিপূরণের অঙ্ক বেশ মোটা রকম বাড়িয়ে দেওয়া হল, যাতে জমি ছাড়তে অনিচ্ছুক কৃষকের সম্মতি পাওয়া যাবে । দ্বিতীয় তত্ত্বের মূলে ব্যক্তিস্বাধীনতার যুক্তি – কৃষকদের সম্মতিই আসল কথা। বলা হল, বেসরকারী সংস্থার প্রকল্পের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ৮০ শতাংশ জমি-মালিকের সম্মতি নিতে হবে। তৃতীয় তত্ত্বের ভিত্তি হল সরকারী নিয়ন্ত্রণের যুক্তি - বাজার এবং ব্যক্তির যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর ভরসা রাখা যায়না, আমলাদের মতামতই আসল কথা। স্থির করা হল, বিশেষজ্ঞরা সামাজিক অভিঘাত নির্ণয় করে ছাড়পত্র দিলে তবেই অবাধে জমি অধিগ্রহণের সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে।

হাঁস হাঁসের নিজস্ব জায়গায় ঠিক আছে, আর সজারুও প্রাণীজগতে স্বমহিমায় উজ্জ্বল, কিন্তু হাঁসজারু যেমন কিম্ভূত এক জীব, এও যেন তাই । একটা কথা আছে না, কোন কমিটির হাতে ঘোড়া বানাতে দিলে সেটা উট হয় (যদিও ব্যক্তিগত ভাবে উট আমাদের খুবই পছন্দের প্রাণী) ! এও সেরকম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একাধারে

আমলা, সুশীল-সমাজকর্মী এবং কৃষকদের সবাইকে খুশি করতে গিয়ে এমন এক আইন তৈরি হল, যে জমি অধিগ্রহণ বিষয়টা শুধু খরচসাপেক্ষই রইল না, উপরন্তু হয়ে পড়ল অতি মন্থর ও জবরজং। এর কারণ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুই দার্শনিক অবস্থানকে জোড়াতালি দিয়ে মেলাতে যাবার প্রচেষ্টা ।

প্রথম অবস্থানটা দার্শনিকদের ভাষায় উপযোগবাদী (utililitarian) মনোভাব থেকে উৎসারিত। সমাজের মোট লাভের অঙ্ক বিচার করতে হবে। যা করলে বৃহত্তর সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়, অথবা দেশের মোট উৎপাদন বাড়ে, তেমন যে কোনো নীতি অবশ্যই অনুসরণীয়। তাতে যদি ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, হোক। দ্বিতীয় অবস্থানটা হল, পরিবর্তন একমাত্র তখনই অনুমোদনীয়, যখন সংশ্লিষ্ট কোনো মানুষেরই স্বার্থে আঘাত না লাগে। এ হল মতৈক্যবাদ (consensualism) – অর্থাৎ সব শরিকের মতের মিল হলে তবেই সে পথে এগোনো যাবে।

২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ আইন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বহুর উন্নতি বনাম এককের স্বার্থরক্ষার সেই দ্বন্দ্ব এখানেও নেপথ্যে কাজ করেছে। আইনটির ভাষা প্রথম দিকে স্পষ্টতঃই মতৈক্যবাদের কথা বলছে বলে মনে হয়। মুখবন্ধটি-তে বেশ ফলাও করে লেখা হয়েছে যে এই আইনের উদ্দেশ্য হল:

> "..বাধ্যতামূলক জমি অধিগ্রহণের ফলে যাদের ক্ষতিস্বীকার করতে হল, তারা যাতে তদ্ভূত উন্নয়নের শরিক হতে পারে, এবং অধিগ্রহণ-পরবর্ত্তী তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা যাতে আগের তুলনায় উন্নত হয়, তা নিশ্চিত করা .."

এই বক্তব্যে বহুজনের কল্যাণের কোনো উল্লেখই নেই। কিন্তু যত আরও পড়তে থাকব, ততই দেখব যে ঝুলি থেকে উপযোগবাদের বেড়ালটি ক্রমশঃ মাথা চাড়া

দিয়ে বেরোচ্ছে। ৮০ শতাংশ মতৈক্যের কথাটাই ধরুন না কেন। এর আবশ্যকতা যে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মালিকানার প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সরকারী প্রকল্পের ক্ষেত্রে নয়, সে কথা প্রায়ই উল্লিখিত হয় না। কোন বেসরকারী কোম্পানি যদি বিমানবন্দর তৈরি করতে জমি অধিগ্রহণ করতে চায় তা হলে চাষীদের রাজি করিয়ে তবেই জমি নিতে পারবে। অথচ একই ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে যদি ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ঐ জমি দখল করেন, তা হলে চাষীদের মতামতের কোনো মূল্যই থাকবে না! রাষ্ট্রের প্রতি এই অন্ধ পক্ষপাত অতীতের বিচারে হাস্যকর। স্বাধীনতার পর থেকে যত জমি বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে, তার ১০ শতাংশেরও কম ব্যবহৃত হয়েছে শিল্পের কাজে। বেশির ভাগটাই খরচ হয়েছে সরকারী খাতে সড়ক, বাঁধ, রেলপথ, প্রশাসনিক ভবন প্রভৃতি নির্মাণ করতে। বাঘ যদি ছাগলের পাল রক্ষা করার দায়িত্ব পায়, তাহলে অন্য কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না এ কথা ঠিক, কিন্তু তাতে ছাগল বেচারিদের কোনো সুবিধে হয় কি?

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে আইন প্রণেতাদের উদ্দেশ্য হল, বেসরকারি সংস্থাকে মতৈক্যের নিয়মে বেঁধে রাখা, কিন্তু সরকারকে বহুজনের হিত্যার্থে ইচ্ছামতো কাজ করার ছাড়পত্র দেওয়া। ইউপিএ-এর এই আইনে এমনও দেখা যাচ্ছে যে রেল, সড়ক ইত্যাদি সংক্রান্ত বেশ কয়েক ধরণের সরকারী প্রকল্পে বর্দ্ধিত হারে ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মোদী সরকারের আনা সংশোধনী বিলের একটা কৃষক-হিতকারী দিক ছিল এই ব্যতিক্রমটি খারিজ করা।

বিমূঢ়তার আরেকটা নমুনা হল একটি বিশেষ জনপ্রিয় অথচ শুচিবায়ুগ্রস্ত মনোভাব, যার স্পষ্ট উল্লেখ ২০১৩ সালের আইনে রয়েছে। তা হল, শুধুমাত্র গণহিতকর কাজেই সরকার তার জমি অধিগ্রহণের অবাধ অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে। কেন এই কাঁটা?

ভূমিহারা সব মানুষের "অধিগ্রহণ-পরবর্ত্তী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন" যদি নিশ্চিত করা যায়, নির্মানকারীরা যদি নিয়মমাফিক ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি থাকে, তা হলে চাষের জমির ওপরে গল্ফ কোর্স অথবা বিলাসবহুল প্রমোদভবন নির্মাণ করতেই বা সরকারী ক্ষমতার প্রয়োগ করা হবে না কেন? দু'পক্ষই লাভবান হলে আপত্তি করবে কে? কোন প্রকল্পগুলি 'গণহিতকর' নামের যোগ্য তাও একবার খতিয়ে দেখার দরকার। নতুন বিমানবন্দর বা চকচকে দূরপাল্লার সড়ক তৈরি হল কি না, তাতে ট্রেনের ছাদে চড়ে যাওয়া নিত্যযাত্রীটির কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় কি? সেই জমির ওপরে বরং একটা বেসরকারী কাপড়ের মিল খুললে কিছু স্বল্প-নৈপুণ্যের কাজের সংস্থান হতে পারত, আর নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য সস্তায় পাইকারি-হারে উৎপন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের একটা সরবরাহ সৃষ্টি হত। বড়লোকের আকাশভ্রমণের সুবিধা করে দিতে সরকার জমি দখল করতে প্রস্তুত, কিন্তু গরীবের গায়ে মোটা কাপড় চড়াতে গররাজি, এ কেমন ন্যায়বিচার?

আসলে তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, 'গণহিতকর' কথাটাও যেন সেই অরওয়েল-বর্ণিত রাজনৈতিক কথনে ব্যবহৃত কপট গম্ভীর শব্দের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যাকে মার্কিনিরা বলেন 'উইজেল ওয়ার্ড', অর্থাৎ চেপে ধরতে গেলে বেজির মত

পিছলে বেরিয়ে যায়। শব্দটা শুনে মনে হয় যেন সাম্যনীতির কথা বলা হচ্ছে, সেই সব বিষয় বা ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হচ্ছে , যেগুলিকে অর্থনীতিবিদরা আবশ্যক পরিকাঠামো বলে চিহ্নিত করেন – যেমন সড়ক, রেলপথ, বিমানবন্দর, প্রতিরক্ষা, পুলিশ, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি। কিন্তু আসলে সব ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। ঝাঁ-চকচকে নতুন বিমানবন্দর তৈরির জন্য জমি নেওয়া হলে সেটা সরকারের অবাধে জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতার আওতায় পড়বে, কিন্তু বেসরকারি একটি কারখানা বা বিদ্যালয় খোলার জন্য এই সুবিধে পাওয়া যাবে না। কোন ক্ষেত্রে ‘গণহিত’ বেশি, ঠিক হবে কি করে?

আসল কথা হল, আইনটি যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁরা নিজেদের সেই ফাঁকা আওয়াজে নিজেরাই ভরসা রাখতে পারেননি যে, এই আইনের জোরে সংশ্লিষ্ট সব মানুষ “উন্নয়নের শরিক” হয়ে উঠবে। ভরসা না করতে পারার কারণও আছে। ২০১৩ সালের আইনে ক্ষতিপূরণের যে অঙ্ক স্থির করা হয়েছে, তা নির্ধারণ করতে কৃষকদের মতামত চাওয়াই হয়নি। একটা যান্ত্রিক সূত্র ধরে, শুধু পুরনো যে অঙ্ক ছিল (ইদানিং কালে ঐ জমির নথিভুক্ত বাজারদর) তাকে দ্বিগুণ (নগরাঞ্চলের জন্য) অথবা চতুর্গুণ (গ্রামাঞ্চলের জন্য) করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দিল্লীতে বসে ঠিক করা একটা ব্যবস্থা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হল, সামাজিক অভিঘাত নির্ধারণ করলেন বহিরাগত বিশেষজ্ঞ-রা, আর মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে চাষীদের শুধু ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ বলার সুযোগ মিলল।

যে ধরণের বড় বড় প্রকল্পে প্রচুর জমির দরকার হয়, সেগুলো ভারতবর্ষে গড়ে ওঠা

কঠিন, কারণ এখানে জমি হাতবদল করতে যে পরিমাণ ঝামেলা পোহাতে হয়, তাতে খাজনার চেয়ে প্রায়ই বাজনা বেশি হয়ে ওঠে। কয়েক হাজার কৃষকের সঙ্গে রফা করতে হয়, ভুলে ভরা দস্তাবেজের পাহাড় ঘেঁটে হয়রান হতে হয়, শরিকে-শরিকে বিবাদ মেটাতে আদালতের শরণাপন্ন হয়ে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়। সিঙ্গুরে টাটা-দের কারখানা গড়তে প্রায় বারো হাজার চাষীর জমি নেওয়া হয়েছিল। সনাতন পদ্ধতিতে এ কাজ কোনোদিন হতে পারত? এই কারণে জমি অধিগ্রহণের সরকারী হস্তক্ষেপ অবশ্যই প্রয়োজন, যদিও সেই ক্ষমতা খুব প্রবল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। নইলে আমরা কোনোদিনই চাষবাসের প্রাধান্য কাটিয়ে উঠে কারিগরি ও পরিষেবা-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে যেতে পারব না।

‘সামাজিক অভিঘাত নির্ধারণ’ (Social Impact Assessment) ওই ‘গণহিতকরের’ মত আরেকটি কপট গম্ভীর শব্দ, যা শুনতে অতি মহৎ কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ও আমলাদের হাতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অনেকটা ক্ষমতা চলে আসে । এর ফলে দুর্নীতি বাড়ে, আসল কাজ পিছোতে থাকে, চাষীদের ওপরে ছড়ি ঘোরানোর সুযোগ পাওয়া যায়। জমি-মালিকের সম্মতি নেওয়ার শর্তটি অবশ্য চাষীদের হাতকে কিছুটা শক্ত করে, কিন্তু খুব বেশি নয়। তারা শুধু দিল্লীতে মঞ্জুর করা ক্ষতিপূরণের অঙ্ক মেনে নিতে পারে, অথবা নাকচ করতে পারে। কিন্তু নিজেদের মনোমত বা প্রয়োজনমত অঙ্কটি জানিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এর থেকে বিবাদের সূত্রপাত হয়ে কিছু সামাজিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্প বে-লাইন হয়ে গেলে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই।

এইসব ঝুটঝামেলার অবসান ঘটাতে মোদী সরকার এমন একটা জমি অধিগ্রহণ

নীতি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল যাতে সমৃদ্ধিকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে, ন্যায়বিচারকে ততটা নয়। ইউপিএ সরকারও এই দ্বন্দ্বে ভুগে ভুগে শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে উঠতে পারেনি। তাদের প্রণীত আইনের মধ্যেই সেই টানাপোড়েন ও স্ববিরোধের লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়।

৪

জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হয় কারণ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পরস্পর-সংলগ্ন জমি দরকার হলে তা খোলা বাজার থেকে কেনা কঠিন। এই সমস্যার সমাধানকল্পেই সরকারের অবাধ জমি অধিগ্রহণের ক্ষমতা প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্যার কারণে যে কোনো বড় মাপের সরকারী বা বেসরকারী প্রকল্প মাঝপথে হোঁচট খেতে পারে, অথবা শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যেতে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত তো রাষ্ট্রকেই বাড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে জমির মালিকদের স্বার্থে যাতে আঘাত না লাগে, এবং প্রতিবাদী হয়ে ওঠার পরিবর্তে তাঁরা যাতে সন্তুষ্ট ও লাভবান হতে পারেন, এটা নিশ্চিত করার মতো ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কী করে নির্ধারণ করা যাবে? এইটাই হল সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু। ‘গণহিতকর’ শব্দের তাৎপর্য্য অথবা বিশেষজ্ঞ-কমিটির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অবান্তর তর্ক করে শক্তিক্ষয় করার দরকার নেই। আফশোসের কথা, ২০১৩ -র আইন বা তার ২০১৫ এর সংশোধিত সংস্করণ এই মূল প্রশ্নের কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি।

আগেই বলেছি, ১৮৯৪ -এর (বর্তমানে খারিজ হয়ে যাওয়া) আইনে যে অতীত বাজারদর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, তা জমি-মালিকের প্রতি

অবিচারী। তা ছাড়া, নথিতে জমির কেনাবেচার দর অনেক সময়ই কমিয়ে লেখা হয়, এবং তাতে অনেক ভুলও থাকে। অতএব ক্ষতিপূরণ দিতে হবে নথিভুক্ত দরের ওপরে ভিত্তি করে নয়, বরং ক্রমঃপ্রতীয়মান নতুন বাজারদরের নিরিখে। কিন্তু সেই হিসেবটা কী করে কষা হবে তার কোনো হদিশ না থাকার ফলে পূর্ববর্ত্তী সরকার সিদ্ধান্ত নিল, নথিভুক্ত দরের চতুর্গুণ হিসেবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ খামখেয়ালী ও যুক্তিরহিত।

মূল সমস্যা এখানে দুটো । প্রথমত, জানতে হবে কোন কৃষক যে কোনো বাস্তবসম্মত দামে আদৌ জমি ছাড়তে চান কিনা, এবং চাইলে, কি দামে ছাড়তে রাজী হবেন । বাস্তবসম্মত দাম বলতে জমির যে সর্বোচ্চ দামে এই প্রকল্প সম্ভব, নয়তো বাতিল করতে হবে, সেটা ধরা হচ্ছে । কিন্তু যেহেতু এঁরা বাজারে জমি বেচতে চাইছিলেননা (তাই অধিগ্রহণের প্রশ্ন উঠছে) এই তথ্য তাঁদের কাছ থেকে জানা সোজা কাজ নয়, যেহেতু সবারই স্বাভাবিক প্রবণতা হবে এই দাম বাড়িয়ে বলার । দ্বিতীয়ত, এমন যদি হয় প্রকল্পের জন্যে প্রস্তাবিত জমিতে বেশ কিছু কৃষক আছেন যাঁরা বাস্তবসম্মত দামে জমি ছাড়তে অনিচ্ছুক তাহলে কি প্রকল্প বাতিল করা হবে, না কি অন্য কোনভাবে ওই অনিচ্ছুক কৃষকদের রাজি করানো সম্ভব ।

আইন প্রণেতা ও আমলাদের অস্পষ্ট আন্দাজের ওপর ভরসা না করেও জমির যথোপযুক্ত হাল বাজারদর নির্ধারণ করার উপায় রয়েছে । অন্যত্র (*Economic and Political Weekly* পত্রিকার ৮ অক্টোবর, ২০১১ সংখ্যায়) আমরা এই নিয়ে বিশদ

আলোচনা করেছি । এখানে আলোচনার স্বয়ংসম্পূর্ণতার খাতিরে সংক্ষেপে সেই বিকল্প মডেলটি বর্ণনা করছি ।

জমি অধিগ্রহণের জন্যে আমাদের প্রস্তাবের ভিত্তি হল নিলামের মাধ্যমে জমির দাম স্থির করা। বিভিন্ন পঞ্চায়েত শিল্প বা পরিকাঠামোর জন্য জমি দেওয়ার প্রস্তাব করবে, এবং একটি ন্যূনতম দাম স্থির করে দেবে। এ বার সরকারী সংস্থা বা শিল্পমহল তাদের সামনে থাকা সবকটি প্রস্তাব থেকে সবচেয়ে পছন্দসই জায়গা বেছে নেবে এবং যে সংস্থা সবচেয়ে বেশি দাম দিতে রাজি হবে, তারাই জমি পাবে। এতে পুরো প্রক্রিয়াটা উল্টে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ রতন টাটা একটা জমি বেছে নিলেন এবং তার পর ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক হাজার ঝামেলা আরম্ভ হল এই পথে না গিয়ে যারা ইচ্ছুক (সেই কারণেই জমি বেচার প্রস্তাব পাঠাবে পঞ্চায়েত), তাদের মধ্যে থেকে জমি বেছে নেওয়া হল। এতে এক দফা ঝামেলা কমবে।

এর পরের ধাপে বেছে নেওয়া পঞ্চায়েতটি প্রত্যেক জমির মালিককে তার মনোমত দর দিতে বলবে। ধরা যাক, শিল্পের জন্য হাজার একর জমি চাই। গ্রামে দু'হাজার মানুষের মাথাপিছু এক একর করে মোট দু'হাজার একর জমি রয়েছে। দু'হাজার জনই দর জমা দেবেন। সেই দরকে যদি কম থেকে বেশি, এ ভাবে সাজানো হয়, তবে প্রথম এক হাজার জনের জমি কেনা হবে। অর্থাৎ সবচেয়ে কম দামে যে এক হাজার একর জমি পাওয়া যাবে, সেটাই কিনে নেবে সরকার । এই এক হাজার জনের চেয়ে যাঁরা বেশি দর দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁর দর সবচেয়ে কম, অর্থাৎ তালিকায় যিনি ১০০১তম, তিনি যে দরে জমি বেচতে চেয়েছিলেন, সেই দর দেওয়া

হবে আগের ১০০০ জনকে। মানে, যত লোকের জমি কেনা হল, তাঁদের প্রত্যেকে যে দাম চেয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি দাম পেলেন।

কিন্তু যে হাজার জন জমি বেচলেন, তাঁদের জমি যে পাশাপাশিই হবে, তেমন তো নয়। মাঝখানে ‘অনিচ্ছুক’ চাষির জমিও থাকতে পারে। এ বার শিল্পের জন্য যে এক হাজার একর প্রয়োজন, তাকে চিহ্নিত করে দেওয়া হল। সেই সীমানার মধ্যে কিছু জমি ইতিমধ্যেই কিনে নেওয়া হয়েছে, কিছু জমি হয়নি। আবার, সীমানার বাইরে যত জমি পড়ে থাকল, তারও কিছুটা কেনা, কিছুটা নয়। এ বার, সীমানার মধ্যে যে অনিচ্ছুকরা আছেন, তাঁদের সীমানার বাইরে অধিগৃহীত জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হল। যেহেতু একই গ্রামের, একই চরিত্রের জমি, তাঁদের আপত্তির কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে না। এই পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটি শেষ হলেই সীমানার মধ্যে সব জমি ফাঁকা সেখানে শিল্প হবে। সীমানার বাইরে অনিচ্ছুকরা নিজেদের জমি নিয়ে থাকবেন। আর যাঁরা জমি বেচে দিয়েছেন, তাঁরা তো নিজেদের পছন্দের চেয়ে বেশি দরই পেলেন। এই পদ্ধতিতে অশান্তি ছাড়াই শিল্পের জমি পাওয়া সম্ভব হবে।

রাষ্ট্র স্বৈরাচারী পদ্ধতিতে ওপর থেকে জমির দর ঠিক করে দিলে জমি অধিগ্রহণের বৈধতা লুপ্ত হয়। যতদিন না জমির দর নির্ধারণ করার কাজে চাষীরা অংশগ্রহণ করতে পারছে, ততদিন এই সমস্যা টিকে থাকবে। অন্য দিকে, চাষীদের মনোমত দর হাঁকাতে বললে তারা রাজকন্যা সমেত অর্দ্ধেক রাজত্ব দাবি করে বসবে। অতএব উপযুক্ত সমাধান হল, সহযোগিতা এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

প্রতিযোগিতা তৈরি করতে গেলে কিছু মানুষকে যেমন সংলগ্ন এলাকায় জমি দিতে হবে, তেমনি সরকারকেও প্রয়োজনমাফিক প্রকল্পটি স্থানান্তরিত করতে পারার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। ধরা যাক সরকার যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে বানাচ্ছে। রাস্তাটা কোথা দিয়ে তৈরি হবে, তার দুই-তিন রকম পরিকল্পনা বানানো হল। আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ঘোষণা করে দেওয়া হল, যেখানকার চাষীরা সবচেয়ে সস্তা দরে জমি ছাড়তে ইচ্ছুক, সেখান দিয়েই সড়ক তৈরি হবে। এই বারে দেখা যাবে, কারুর ওপরে বলপ্রয়োগ করতে হচ্ছে না, এবং চাষীরা ন্যায্য মূল্যে জমি ছেড়ে দিতে আগ্রহ প্রকাশ করছে।

জমি, খনিজ পদার্থ, প্রাকৃতিক গ্যাস, বেতার কম্পাঙ্ক প্রভৃতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত বিনিময়মূল্য নির্ধারণ করতে পারার অক্ষমতাই হল আমাদের অনেক আধুনিক সমস্যার উৎস। ইউপিএ সরকারের বড় বড় কেলেঙ্কারির থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ যে রাজনৈতিক নেতা, আমলা এবং বিশেষজ্ঞ-কমিটির বিবেচনার ওপরে ভরসা করে বসে থাকলে তা হবে অন্ধের হস্তি-বর্ণনার ওপরে নির্ভর করার সামিল। দুর্নীতি সৃষ্টি হওয়ারও সম্ভাবনা প্রবল। একমাত্র স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মধ্যে দিয়েই কোনো দুর্লভ সম্পদের উচিৎ মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব।

পরিতাপের বিষয়, জমির ক্ষেত্রে এই সমাধানসূত্র আমরা গ্রহণ করিনি। ক্ষমতাবান আমলা ও বিশেষজ্ঞদের ছড়ি ঘোরানোর প্রবণতার কথা জেনেও আমরা সামাজিক অভিঘাত নির্ণয়ের দাবি করতে থাকি। নয়াদিল্লী-তে বসে জমির যে অলীক দর কষা

হয়, তাতে কৃষককে অংশগ্রহণ করতে দেওয়ার দাবিতে আমরা মুখর হয়ে উঠি, কিন্তু নিজের জমির ন্যায্য দামে নিজের কোন বক্তব্য থাকার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, এ কথাটা ভুলে যাই। ২০১৩ –র আপাত-কৃষকদরদী জমি অধিগ্রহণ আইন একটু মুরুব্বিয়ানার ঢঙে চাষীদের অনুগ্রহ করার একটা ভঙ্গি করেছিল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো লাভই এতে হয়নি।

সমৃদ্ধি ও সুনীতি কি তবে কোনোদিনই এক বিন্দুতে মিলবে না ? ২০১৩ -র আইনের সবচেয়ে বড় খুঁত হল, ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ক্ষতিপূরণের অঙ্ক, এবং সে ব্যাপারে চাষীদের মতামত জানতে চাওয়ার অনিচ্ছা। বাসি খবরের ভিত্তিতে পক্ষপাতী হিসেব কষে যে দাম ঠিক করা হল, তার সঙ্গে সেই অঞ্চলে কোনো বড় শিল্পপ্রকল্প রূপায়িত হলে বা পরিকাঠামো-গত পরিবর্তন ঘটে গেলে যে বাস্তব দেখা দেবে, তার কোনো তুলনাই হয়না। পুরনো অঙ্কের দ্বিগুণ-চতুর্গুণ যাই করা হোক না কেন, সে যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার সমান – যদি লেগে যায় তো ভাল, নইলে যা পারো করো। তার চেয়ে বরং প্রকল্প- ও প্রকল্প-সংলগ্ন জমি আমাদের প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে নিলামে চড়ালে চাষীদের খুশি করতে পারা যেত, আর জমির সর্বাধিক ফলদায়ী ব্যবহার সম্ভব হত।

৫

বর্তমান সরকার ইউপিএ -র জমি আইনের ভুল শুধরাতে পারেনি, ওপর-ওপর কিছুটা রদবদল করেছিল মাত্র। তাই বাধা আসামাত্র পাততাড়ি গুটিয়ে পিছু হাঁটতে

হয়েছে। আসলে সুদিনের স্বপ্ন দেখানো এবং অনেকদিন ক্ষমতায় থাকার পরে ক্লান্ত এবং সমস্যা-জর্জরিত কোন সরকারের বিরুদ্ধে অপদার্থতার স্লোগান ওঠানোর কাজটা সোজা। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর উন্নয়নের নীতিনির্ধারণের পথে মৌলিক যে কিছু দ্বন্দ সেগুলো কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যায়না, ঢাকা যায়না হিন্দু সভ্যতার অতীত গৌরব নিয়ে উদ্দীপক বক্তৃতা দিয়ে, বা এই-দিবস ওই-দিবস পালন করার উৎসবে মেতে।

জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে যে প্রহেলিকাময় গোলকধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে, তার জট কাটিয়ে বেরোতেই হবে। কিন্তু সেই জায়গায় নতুন যে আইন আসবে, তাতে ওপর থেকে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক চাপিয়ে না দিয়ে তৃনমূল স্তর থেকে উঠে আসা অঙ্ককে মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। এখন অবধি ইউপিএ বা এনডিএ সরকারের আইনি প্রচেষ্টা এই মৌলিক সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়নি, বাজার যেখানে ব্যর্থ, সেখানে গণহিতের ঠিকাদার সবজান্তা সরকার এবং বাধ্য নাগরিক এই মডেলের বাইরে বেরোবার সাহস দেখায়নি। যতদিন সেটা না হচ্ছে, ততদিন বস্তাপচা চাপান- চাপান-উতোরের ফাঁদ থেকে উন্নয়নের মুক্তি পাবার আশা নেই।

(এই বিষয়ে আমাদের লেখা ইংরেজি প্রবন্ধের থেকে কিছু অংশের অনুবাদ করে দিয়েছেন তথাগত বন্দ্যোপাধ্যায়। মনীষিতা দাসের পরামর্শে লেখাটি থেকে অনেক মেদ ঝরানো সম্ভব হয়েছে। তা সত্ত্বেও লেখাটির প্রাপ্য সমালোচনার ন্যায্য ভাগীদার একমাত্র লেখকেরাই।)